তারিখ ..২২ NOV 2016..
পৃষ্ঠা ... ... কলাম... ... ...

সংবাদ

প্রতি : মাদ্রাসায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এ লক্ষে যুগোপযোগী কারিকুলাম তৈরি করতে হবে।' শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা জানানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেছেন, সরকার একদিকে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের নামে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছেন। আরেকদিকে সারাদেশে নিয়মনীতি উপেক্ষা করে গড়ে উঠছে কওমি মাদ্রাসা। বর্তমানে দেশে প্রায় ২০ হাজার কওমি মাদ্রাসা রয়েছে। এসব মাদ্রাসার ওপর শিক্ষা প্রশাসন বারবার কর্তৃত্ব আরোপের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য সচিব প্রফেসর শেখ ইকরামুল কবির সংবাদকে বলেন, 'মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের যেহেতু বাদ দেয়া যাচ্ছে না, এজন্য তাদের উন্নয়ন করে সাধারণ শিক্ষার ধারায় নিয়ে আসা হচ্ছে। এখন মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ও বাংলা পড়ানো হচ্ছে।'

নায়েমের সাবেক এই মহাপরিচালক বলেন, 'সাধারণ মাদ্রাসার উন্নয়ন করা গেলেও কওমি মাদ্রাসার ওপর প্রশাসনের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হলেও কওমি মাদ্রাসার প্রতিনিধিরা এটা মানেননি। তারা শিক্ষার মূল ধারায় আসতেও নারাজ। তবে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হলে কওমি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণে আসতে বাধ্য হতো।'

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামো নির্মাণের কাজ করে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর (ইইডি)। এ সংস্থার প্রধান প্রকৌশলী দেওয়ান মো. হানজালা সংবাদকে জানান, 'মাদ্রাসার উন্নয়নে এই সরকারই সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে। গত আট বছরে সারাদেশে এক হাজার ৩৩২টি মাদ্রাসায় নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। গড়ে প্রতিটি মাদ্রাসায় প্রায় ৭৫ লাখ টাকার অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে। নতুন আরও দুই হাজার মাদ্রাসার অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।'

মাদ্রাসার পেছনে এতো অর্থ-ব্যয়ের ফলে সরকারের কী লাভ হলো- এমন প্রশ্নের জবাবে প্রধান প্রকৌশলী বলেন, 'মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা মূল ধারার শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারছে। মাদ্রাসা ছাত্রছাত্রী ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার হতে পারছে। পিএইচডি ডিগ্রিও অর্জন করতে পারছে।'

২০০৯ সালে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হলেও, সাত বছরে মাদ্রাসা শিক্ষায় এর প্রভাব পরেনি। প্রায় ১৬ হাজার এমপিওভুক্ত ও আংশিক এমপিওভুক্ত মাদ্রাসার কার্যক্রম তদারকি করারও যেন কেউ নেই। মাদ্রাসার সুপার ও শিক্ষক-কর্মচারীদের ঢালাওভাবে এমপিওভুক্তি করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)।

অথচ সকল ধরনের মাদ্রাসাকে একটি সুষ্ঠু ধারার মধ্যে আনতে শিক্ষানীতিতে পরামর্শ থাকলেও দেশের প্রায় ২০ হাজার কওমি মাদ্রাসার কার্যক্রমের ওপর গত সাত বছরে ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব আরোপ করতে পারেনি শিক্ষা প্রশাসন।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরিদর্শক আবুল বাশার সংবাদকে বলেন, 'মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণে কোন নীতিমালা' নেই। সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে নীতিমালায় পরিচালনা করা হয় সেই আলোকেই মাদ্রাসা পরিচালনা হয়। এর জন্য পৃথক বা সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই।'

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে ডেপুটি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞলব্ধ ওই কর্মকর্তা জানান, 'সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় মাদ্রাসায় অনিয়ম, জনবল নিয়োগে অস্বচ্ছতা ও পরিচালনা পরিষদে দ্বন্দ্ব কিছুটা বেশি। কারণ বেশিরভাগ মাদ্রাসাই বেসরকারি। সরকারি মাদ্রাসা রয়েছে মাত্র ২/৩টি।'

আবুল বাশার জানান, 'দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল স্তরের মাদ্রাসায় সরাসরি এমপিও দেয় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর। কিন্তু এবতেদায় (প্রাথমিক স্তর) মাদ্রাসায় অনুদান (এমপিও) দেয় সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আর এই পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।'

মাদ্রাসা পরিচালনায় নেই নীতিমালা

মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর কোন নীতিমালা নেই। ১৯৬১ সালের ঢাকা জেলা প্রশাসকের আদেশের ওপর ভিত্তি করে দায়সারাভাবে চলছে মাদ্রাসা শিক্ষা। সরকারের অনুদানে (এমপিও) পরিচালিত হলেও প্রায় সব মাদ্রাসা চলছে সুপার, প্রিন্সিপালসহ গভর্নিং বডির ইচ্ছায়। গভর্নিং বডিতে সুপার ও প্রিন্সিপালরা হচ্ছেন সদস্য সচিব। গভর্নিং বডিতে এসে প্রভাবশালীরা সরকারের আদেশ নির্দেশ অমান্য করে ইচ্ছেমতো প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে বলে অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এতে প্রতিষ্ঠান পরিণত হচ্ছে নিয়োগ ও ভর্তি বাণিজ্যের হাতিয়ার হিসেবে। অনেক ক্ষেত্রে সুপার ও প্রিন্সিপালরা নিজেদের পছন্দের লোক দিয়ে গভর্নিং বডি বা পরিচালনা পরিষদ গঠন করছেন। এমপিওভুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ আনা জরুরি এবং এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগ দরকার বলেও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন।

জানা গেছে, বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মাদ্রাসার (সরকার স্বীকৃত) আছে ১৬ হাজার ২২৬টি। এর মধ্যে পূর্ণ এমপিওভুক্ত দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা আছে সাত হাজার ৬১০টি। এমপিওভুক্ত শিক্ষক আছেন এক লাখ ২০ হাজার। কর্মচারী আছে প্রায় ৪০ হাজার। এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীর জন্য প্রতি মাসে সরকারের ব্যয় হচ্ছে প্রায় দুইশ' কোটি টাকা। আর এবতেদায়ী মাদ্রাসা আংশিক এমপিওভুক্ত। এমপিওভুক্ত সকল মাদ্রাসায় শিক্ষার্থী আছে প্রায় অর্ধকোটি। এছাড়াও নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারী আছে।

একমাস পর পর এমপিওভুক্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শূন্যপদে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্ত করা হয়। এতে প্রতি এমপিও-তে দুই থেকে তিন হাজার শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্তি পায়। এর মধ্যে মাদ্রাসায় প্রতি মাসে ৭০০ থেকে ৮০০ জন এমপিওভুক্তি পায় অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে বা সংখ্যার হিসেবে মাদ্রাসা শিক্ষকরাই বেশি আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন। কারণ শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়োগ, প্রাপ্যতা, শূন্যপদ, মাদ্রাসায় আদৌ প্রয়োজনীয় ছাত্রছাত্রী আছে কী না সেসব বিষয় বিবেচনায় নেয়া হয় না।

দেশে তিন ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এর মধ্যে আলিয়া মাদ্রাসা সরাসরি সরকার নিয়ন্ত্রিত ও এমপিওভুক্ত বা আংশিক এমপিওভুক্ত মাদ্রাসা। অপরটি হলো কওমি মাদ্রাসা, যা সরকার অনুমোদিত নয়। ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের নামে এক শ্রেণীর ব্যক্তি নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী যখন যেখানে খুশি কওমি মাদ্রাসা চালু করছে। দাখিল বা মাধ্যমিক স্তরের মাদ্রাসার প্রধানকে বলা হয় সুপার। আলিম বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের মাদ্রাসা প্রধানকে বলা হয় প্রিন্সিপাল। গত এপ্রিলে তৈরি করা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে মোট সরকারি-বেসরকারি এমপিওভুক্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা রয়েছে ৩১ হাজার ৪৪৮টি। এর মধ্যে ২০০৯ সালের এপ্রিল থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রকল্পভুক্ত দশ হাজার ১২৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কাজ হাতে নেয়া হয়। এর মধ্যে সাত হাজার ৫৬৯টি প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন নির্মাণের পূর্ণাঙ্গ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। বাকি দুই হাজার ৪১৫টি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে।

মাদ্রাসার উন্নয়নের নামে অপচয়

মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণের নামে সরকারি অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহারেরও অভিযোগ রয়েছে। জানা গেছে, এই সরকারের আমলে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট বা এসইএসডিপি প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন জেলার (৩৪টি) মাদ্রাসায় বিজ্ঞান শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হয়। প্রতিটি মাদ্রায় প্রায় দেড় কোটি টাকার কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। পরবর্তীতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) কর্মকর্তারা পরিদর্শন করে দেখতে পায়- সাতটি মাদ্রাসায় বিজ্ঞান শাখাই নেই। অর্থাৎ এসব মাদ্রাসায় বিজ্ঞান পড়ানোর অনুমোদনই নেই। পরে প্রায় দশ কোটি টাকার শিক্ষা উপকরণ অব্যবহৃত পরে থাকে এবং কিছু উপকরণ অন্য প্রতিষ্ঠানে দেয়া হয়।